আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি

অধ্যাপক গোলাম আযম

আল্লাহর খিলাফত কায়েমের পদ্ধতি

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশক
মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন
মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
কামিয়াব প্রকাশন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
ফোন ৭১১২২০৪, ০১৮২১৬৬০৪, ০১৭৮৮২৮৭০

স্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০০২

মূল্য
দশ টাকা
একদামে ক্রয় করুন

প্রচ্ছদ
দি প্রিন্ট মাস্টার

বর্ণবিন্যাস
কম্প্রিন্ট মিডিয়া এন্ড পাবলিশার্স

মুদ্রণ
কালার মাস্টার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং

www.pathagar.com

আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব

দুনিয়াতে মানুষ আল্লাহর খলীফা। আল্লাহ তাআলা মানুষকে খলীফা হিসাবেই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন—এ কথাগুলো সবাই অহরহই বলেন। কিন্তু খলীফা হিসাবে মানুষের দায়িত্ব কী তা কমই চর্চা করা হয়। অথচ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাও অত্যন্ত প্রয়োজন।

মানুষকে সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের নিকট ঘোষণা করলেন যে, তিনি পৃথিবীতে এমন এক নতুন সত্তাকে সৃষ্টি করতে চান, যে খলীফার মর্যাদা পেতে পারে (সূরা বাকারাহ ঃ ৩০)। তারাই এ মর্যাদার অধিকারী হবে যারা খলীফা হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করবে। পুস্তিকাটিতে এ মহান দায়িত্ব সম্পর্কেই সুস্পষ্ট ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ছোট বড় সকল সৃষ্টির জন্যই বিধান দিয়েছেন। সকল সৃষ্টি বাধ্য হয়েই তাঁর বিধান মেনে চলছে বলে সূরা আলে ইমরানের ৮৩ নং আয়াতে ঘোষণা করে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, "মানুষের জন্য আমার রচিত বিধান মানতে তাদেরকে বাধ্য করিনি বলেই কি তারা আমার বিধানের বদলে অন্য বিধান তালাশ করে?"

স্রষ্টা তাঁর সকল সৃষ্টির উপরই তাঁর রচিত বিধান নিজেই জারী করেন। কিন্তু মানুষের জন্য রচিত তাঁর বিধানকে নিজে জারী না করে তাঁর পক্ষ থেকে নবী ও নবীর উপর যারা ঈমান আনে তাদের উপর জারী করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এটাই খলীফা বা প্রতিনিধির দায়িত্ব।

সূরা আত্-তাওবার ৩৩ নং আয়াত, সূরা আল-ফাত্হ-এর ২৮ নং আয়াত ও সূরা আস্ সাফ্ফের ৯ নং আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহর বিধানকে বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়েই তিনি রাসূল (স)-কে পাঠিয়েছেন। রাসূল (স) প্রথমে মদীনায় এবং ক্রমে গোটা আরব দেশে আল্লাহর একমাত্র হক দীনকে বিজয়ী করার মহান দায়িত্ব পালন করে তাঁর উম্মতের জন্য সুন্দরতম উদাহরণ রেখে গেছেন। এ দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার কায়েম করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করাই খিলাফতের দায়িত্ব। এটাই ইকামাতে দীনের দায়িত্ব।

এ বিরাট দায়িত্বটি রাসূল (স) যে পদ্ধতিতে পালন করেছিলেন, সে পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন উপায়ে পালন করা সম্ভব নয়। এ পদ্ধতিটিও আল্লাহ তাআলাই শিক্ষা দিয়েছেন। এ পুস্তিকাতে ঐ পদ্ধতি আলোচনার সাথে সাথে খিলাফতের দায়িত্ব পালনের বাস্তব রূপ সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

দীনের মহান খাদেমগণ মসজিদ, মাদরাসাহ, খানকাহ, তাবলীগ, ওয়াজ, তাসনীফ (বই লেখা) ইত্যাদি উপায়ে ইসলামের যে বিরাট খেদমত করছেন, তা অবশ্যই ইকামাতে দীনের সহায়ক। কিন্তু শুধু এসব খেদমত দ্বারাই ইসলাম বিজয়ী হতে পারে না। অথচ ইসলামকে বিজয়ী করার জন্যই রাসূল (স)-কে পাঠানো হয়েছে।

ইকামাতে দীনের দায়িত্বই খিলাফতের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে গেলে দীনে বাতিল অবশ্যই বিরোধিতা করবে। হক ও বাতিলের এ সংঘর্ষ এড়িয়ে দীনের কিছু খেদমত করা যায় বটে, কিন্তু দীনকে বিজয়ী করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

দীনে বাতিলের অধীনে থেকেও ইসলামের কিছু খেদমত করা যায়। বর্তমানে আমাদের দেশে দীনে বাতিলই বিজয়ী আছে। এ অবস্থায়ও দীনের খাদেমগণ ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছেন। বাতিল শক্তি খেদমতে দীনকে তাদের জন্য মারাত্মক মনে করে না বলেই ইসলামের খেদমতের কাজকে বরদাশ্‌ত করে। এমনকি তাদের স্বার্থেই খেদমতে দীনের সহযোগিতাও করে। কিন্তু তারা ইকামাতে দীন বা আল্লাহর খিলাফত কায়েমের প্রচেষ্টাকে তাদের জন্য মারাত্মক মনে করে।

দীনের সম্মানিত খাদেমগণের নিকট আমার আকুল আবেদন যে, আপনারা আমার এ কথাটি মেহেরবানী করে বিবেচনা করুন ঃ

"দীনকে বিজয়ী করার যে বিরাট দায়িত্ব আপনাদের উপর রয়েছে. তা পালনের উদ্দেশ্যে ইকামাতে দীনের যে কোন সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করুন। যেসব সংগঠন চালু আছে এর মধ্যে যে সংগঠন আপনাদের বেশি পছন্দ হয় তাতেই শরীক হোন। যদি কোনটাই পছন্দ না হয়, তাহলে আরও উন্নতমানের সংগঠন কায়েম করুন। কারণ দীন ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে জিহাদ করা ছাড়া আল্লাহর খলীফার মর্যাদা হাসিল করা সম্ভব নয়। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর দাবি এটাই।

বাংলাদেশে দীনের খাদেমগণের বিরাট শক্তি রয়েছে। কিন্তু এ শক্তি সংগঠিত নয়। বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, শক্তিহীন অবস্থায় থাকায় বাতিল শক্তি দেশে বিজয়ী হয়ে আছে। দীনের সকল খাদেম ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে সংগঠনভুক্ত হলে দীনে হক অবশ্যই বিজয়ী হবে। দীনের শক্তি সংগঠিত না হওয়ার কারণেই আল্লাহর খিলাফত কায়েম হচ্ছে না। এ দায়িত্ব পালন না করলে আল্লাহর দরবারে কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হবে কিনা?"

গোলাম আযম

২৫ আগস্ট, ২০০২

www.pathagar.com

সূচিপত্র

সৃষ্টি জগতে মানুষের মর্যাদা/৭
আল্লাহর একচ্ছত্র রাজত্ব/৭
মানুষের ইসলাম/৮
খিলাফতের দায়িত্বটা কী/৮
খিলাফতের দায়িত্বের বিভিন্ন দিক/৯
মানুষ গড়ার দায়িত্ব/৯
মানুষ গড়ার পদ্ধতি/১০
পরিবার গঠনের দায়িত্ব/১৫
আল্লাহর খিলাফত কায়েমের পদ্ধতি/১৬
লোক তৈরির পদ্ধতি/১৬
দাওয়াত/১৬
সংগঠন/১৭
লোক তৈরির কর্মসূচি/১৮
ইতিবাচক চার দফার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা/১৯
নেতিবাচক কর্মসূচি/২০
রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে খিলাফতের দায়িত্ব/২২
প্রথম দফা ঃ চরিত্র গঠন করা/২৩
দ্বিতীয় দফা ঃ জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ/২৪
যাকাতের শিক্ষা/২৬
বিশ্বে খাদ্যাভাবের জন্য মানুষই দায়ী/২৬
তৃতীয় দফা ঃ কল্যাণমূলক কাজ চালু করা/২৭
চতুর্থ দফা ঃ অনিষ্টকর কাজ বন্ধ করা/২৯
খলীফা পরিভাষাটির বিশেষ গুরুত্ব/৩১
খলীফা হওয়ার কারণেই মানুষের এত ক্ষমতা/৩১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সৃষ্টি জগতে মানুষের মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা বিশাল সৃষ্টি জগতে যত প্রাণী সৃষ্টি করেছেন এর মধ্যে মানুষ, জিন ও ফেরেশতাকেই শুধু ভাল ও মন্দের বিচার-বিবেচনার যোগ্যতা দান করেছেন। এর মধ্যে ফেরেশতাকে মন্দ কাজ করার এখতিয়ার দেননি। তাদেরকে আল্লাহর হুকুম পালনের দায়িত্ব দিয়েছেন; হুকুম অমান্য করার কোন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। তাই ফেরেশতারা তাদের কাজের পুরস্কার পাওয়ার অধিকারীও নয়, শাস্তি পাওয়ার যোগ্যও নয়।

পুরস্কার ও তিরস্কার শুধু মানুষ ও জিন জাতির জন্য। এ দু'প্রকার প্রাণীকেই শুধু ভাল ও মন্দ উভয় রকম কাজ করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। মন্দ কাজের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মন্দ না করে ভাল কাজ করার কারণে তারা পুরস্কার পাওয়ার অধিকারী। তেমনি ভাল কাজ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মন্দ কাজ করার কারণে তারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

মানুষ ও জিন জাতির মধ্যে একটি বিষয়ে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত কায়েমের দায়িত্ব দিয়েছেন। জিন জাতিকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। নবী-রাসূলগণকে খিলাফত কায়েমের দায়িত্ব দিয়েই পাঠানো হয়েছে। তাই নবী ও রাসূল মানুষের মধ্য থেকেই পাঠানো হয়েছে। জিন জাতির মধ্যে কোন নবী-রাসূল পাঠানো হয়নি। এতেই প্রমাণিত হয় যে, মানুষই সৃষ্টির সেরা—আশরাফুল মাখলূকাত।

আল্লাহর একচ্ছত্র রাজত্ব

আল্লাহ তাআলা সূরা আল আনআমের ৮৩ নং আয়াতে দাবি করেছেন যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই বাধ্য হয়ে আল্লাহর বিধান মেনে চলে। আয়াতের শুরুতে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, মানুষকে আল্লাহর বিধান মানতে বাধ্য করেননি বলেই কি মানুষ আল্লাহর বিধান (দীন) ছাড়া অন্য বিধান তালাশ করে?

আল্লাহ তাআলা তাঁর ছোট-বড় সকল সৃষ্টির জন্যই বিধি-বিধান তৈরি করেছেন। এটম থেকে সূর্য পর্যন্ত, ঘাস থেকে বৃক্ষ পর্যন্ত, পিঁপড়া থেকে হাতি পর্যন্ত সকল জড় পদার্থ ও জীবজন্তুর উপযোগী নিয়ম-কানুন তৈরি করেছেন। এ সব নিয়ম-বিধান তিনি নবীর মাধ্যমে জারি করেন না। তিনি নিজে সরাসরি প্রতিটি সৃষ্টির উপর ঐ সৃষ্টির উপযোগী বিধান চালু করেন। উপরিউক্ত আয়াতে এ কথাটিকে আল্লাহ যে ভাষায় প্রকাশ করেছেন তা হল ঃ

وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ـ

অর্থ ঃ আসমান-যমীনে যত কিছু আছে সবই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।

www.pathagar.com

এখানে أَسْلَمَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ ইসলাম গ্রহণ করেছে বা আত্মসমর্পণ করেছে। সকল সৃষ্টিই বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কোন সৃষ্টিই স্বাধীন নয় এবং আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজের মর্জিমত চলতে সক্ষম নয়। গোটা সৃষ্টিলোকে আল্লাহর আরোপিত বিধানের কঠোর রাজত্ব কায়েম রয়েছে। বিজ্ঞানের যত উন্নতি হচ্ছে ততই এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে। প্রকৃতির জগতে যে নিয়ম চিরন্তনভাবে চালু আছে তা আল্লাহরই রচিত, মানুষের রচিত নয়—এ কথা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই।

ঐ আয়াতের মর্ম অনুযায়ী ইসলামের সংজ্ঞা দাঁড়ায় নিম্নরূপ ঃ

"সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার রচিত বিধানই ইসলাম।" যে সৃষ্টির জন্য যে বিধান দেওয়া হয়েছে, সেটাই ঐ সৃষ্টির ইসলাম। প্রত্যেক সৃষ্টি আল্লাহর বিধান মেনে চলছে বলেই বলা যায় যে, প্রত্যেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। অবশ্য তারা বাধ্য হয়েই ইসলাম গ্রহণ করে থাকে।

মানুষের ইসলাম

মানুষের জন্য আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন তা মেনে চলার জন্য তাদেরকে বাধ্য করেননি। মানুষের জন্য রচিত ইসলামই নবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং এ বিধান মানব সমাজে চালু করার দায়িত্বও নবী ও নবীর প্রতি বিশ্বাসীদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। অন্যান্য সৃষ্টির জন্য রচিত ইসলাম আল্লাহ স্বয়ং সরাসরি জারি করেন। কিন্তু মানুষের জন্য রচিত ইসলাম তিনি সরাসরি চালু না করার সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। তাই মানুষের ইসলাম নবীর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন এবং তা জারি করার দায়িত্বও নবী ও নবীর অনুসরণকারীদের উপরই অর্পণ করেছেন।

বিধানটি আল্লাহর। তাঁর পক্ষ থেকে সে বিধান কায়েমের দায়িত্ব পালন করাটাই খিলাফতের দায়িত্ব। খলীফা মানব প্রতিনিধি। প্রতিনিধি নিজে মালিক বা মনিব নয়। যাঁর প্রতিনিধি তিনিই মালিক। প্রতিনিধির দায়িত্বই হল মনিবের পক্ষ থেকে তাঁরই মর্জিমত কাজ করা। অর্থাৎ নবীর নিকট যে ইসলাম পাঠানো হয়েছে তা আল্লাহ নিজে চালু করবেন না বলেই তাঁর পক্ষ থেকে যাঁরা তা চালু করার চেষ্টা করে তাঁরাই খলীফার দায়িত্ব পালন করল।

খিলাফতের দায়িত্বটা কী

ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মানব জাতির জন্য যে জীবন বিধান পাঠিয়েছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাস্তবে চালু করেছেন। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই তিনি আল্লাহর বিধান চালু করে দুনিয়ার অসভ্যতম জাতিকে মানব সভ্যতার শিক্ষকে পরিণত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম' নবুওয়াতের ২৩ বছর যা করেছেন, এর সবটুকুই খিলাফতের দায়িত্ব। তিনি একটি আদর্শ মানব সমাজ কায়েম করে দেখিয়ে গেলেন যে, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হলে তা সকল দিক দিয়ে কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। দুনিয়াতে যতটুকু সুখ-শান্তি মানুষের পাওয়া সম্ভব তা একমাত্র আল্লাহর বিধানের মাধ্যমেই পেতে পারে। মানব রচিত কোন বিধানের মাধ্যমে তা পাওয়ার উপায় নেই।

খিলাফতের দায়িত্বের বিভিন্ন দিক

মানুষ গড়ার দায়িত্ব

আল্লাহ তাআলা মানুষকে নৈতিক জীব হিসেবে দেখতে চান। মানুষকে যে দেহ দান করা হয়েছে তা আসল মানুষ নয়; আসল মানুষ হল রূহ। দেহ বস্তুগত উপাদান দিয়ে তৈরি বলে বস্তুজগতের প্রতি এর প্রবল আকর্ষণ রয়েছে। দেহের সকল দাবিকে নাফস বলা হয়। নাফসের কোন নৈতিক চেতনা নেই। আল কুরআনের ১২ নং পারার প্রথম আয়াতে আছে ঃ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْءِ

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই নাফস অবশ্যই মন্দের হুকুমদাতা। (সূরা ইউসুফ ঃ ৫৩)-

রূহই হল নৈতিক চেতনা, যাকে বিবেক বলা যায়। কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, আদম সৃষ্টির পর সকল মানুষের রূহ একই সাথে পয়দা করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছেন ঃ

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا ـ

অর্থ ঃ আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল, অবশ্যই আমরা এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি। (সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৭২)

ভাল-মন্দ বিচারবোধ সম্পন্ন সৃষ্টি হিসেবে রূহই আসল মানুষ। এ মানুষকে আল্লাহ তাআলা দুটো জিনিস দিয়েছেন। একটি হল সৃষ্টি-জগৎ এবং অপরটি হল জগৎকে কাজে লাগাবার যোগ্য হাতিয়ার। দেহটিই ঐ হাতিয়ার।

يا ايها الناس (হে মানব জাতি!) বলে আল্লাহ যাদেরকে সম্বোধন করেন তারা মানুষের দেহ নয়; রূহ। মানুষের জন্য যে বিধান (ইসলাম) পাঠিয়েছেন তা মেনে চলার দায়িত্ব এ রূহকেই দেওয়া হয়েছে। তাই এ বিধান মানার যোগ্য হতে হলে রূহকে দেহের উপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করার যোগ্য হতে হবে। দেহটি যদি রূহের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয় তাহলে ঐ দেহ পশুর চেয়েও অধম বলে কুরআনে বলা হয়েছে।

তাই সত্যিকার মানুষ হতে হলে রূহকে এতটা শক্তিশালী হতে হবে, যাতে দেহকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। মানুষ গড়ার আসল কাজই এটা। আল্লাহ তাআলা চান যে, মানুষ এ মানে গড়ে উঠুক। গড়বার নিয়ম আল্লাহই দিয়েছেন।

www.pathagar.com

কিন্তু এ কাজটি আল্লাহ নিজে করেন না। তাঁর পক্ষ থেকে তাঁরই দেওয়া নিয়মে যারা এ কাজটি করে তারা খিলাফতের দায়িত্ব পালন করল।

মানুষ গড়ার পদ্ধতি

মানুষ গড়ার আল্লাহর শেখানো পদ্ধতিটি কী তা জানা জরুরি। মানুষ গড়া মানে মানুষের মন, মগজ ও চরিত্র গড়ে তোলা। মনের সাথে ঈমানের সম্পর্ক, মগজের সাথে ইলমের সম্পর্ক এবং চরিত্রের সাথে আমলের সম্পর্ক।

উন্নত নৈতিক জীব হিসেবে মানুষকে গড়তে হলে মনে খাঁটি ঈমান, মগজে নির্ভুল শিক্ষা এবং চরিত্রে মানবিক গুণাবলি সৃষ্টি করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে ঈমান, ইলম ও আমল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

১. ঈমান

ঈমান অর্থ বিশ্বাস। বিশ্বাস জিনিসটা কী?

বিশ্বাসের সহজ সংজ্ঞা ঃ যে বিষয়ে সরাসরি বা প্রত্যক্ষ (Direct) জ্ঞান নেই, অথচ সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে, তখন পরোক্ষ (Indirect) জ্ঞানের মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এ সিদ্ধান্তই বিশ্বাস। বাস্তব জীবনে পদে পদে মানুষকে এভাবেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

এ বিশ্বের কোন স্রষ্টা আছে কিনা এবং মৃত্যুর পর আবার জীবিত হতে হবে কিনা, এ সব বিষয়ে সরাসরি কোন ধারণা মানুষের নেই। এ সব প্রশ্নের সঠিক জওয়াব দেবার জন্য কারো কাছেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। কুরআনে এ সব বিষয়ে বিপুল পরোক্ষ জ্ঞান দান করা হয়েছে। ঐ সব জ্ঞানে এমন বলিষ্ঠ যুক্তি রয়েছে, যার ভিত্তিতে এক বিশেষ ধরনের বিশ্বাস জন্মে—,এরই নাম ঈমান।

কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে তাকে ঃ

ক. আল্লাহ, ফেরেশতা, আল্লাহর কিতাবসমূহ, আল্লাহর রাসূলগণ, আখিরাত (পরকাল), তাকদীর ও মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাস করতে হবে।

খ. আল্লাহর উপর ঈমান আনলে আল্লাহর সাথে ঈমানদারের যে সম্পর্ক হয় তা অনুভব করতে হবে। সূরা 'আনআম'-এ আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন, "তিনি মানুষের রব, বাদশাহ ও ইলাহ (হুকুমকর্তা)।" এ সব সম্পর্কের তাৎপর্য জানতে হবে।

গ. কী কারণে ঈমান দুর্বল হয় তা জানতে হবে। ঈমান দুর্বল হলে আল্লাহর সাথে ঐ সব সম্পর্ক বহাল থাকতে পারে না।

ঘ. ঈমানকে মযবুত করার জন্য যে দুটো শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন তা ভালভাবে বুঝতে হবে। প্রথমত ঈমানকে শিরকমুক্ত হতে হবে। দ্বিতীয়ত তাগূতকে মানতে অস্বীকার করতে হবে। শিরক ও তাগূত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

[দ্রষ্টব্য ঃ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে লেখকের 'মযবুত ঈমান' বইটি পড়ুন।]

www.pathagar.com

২. ইলম

ইলমের দিক দিয়ে গড়ে উঠতে হলে জানতে হবে ঃ

ক. ইলম শব্দের আভিধানিক অর্থ জ্ঞান। ইসলামী পরিভাষায়, কুরআন ও হাদীসে ইলম শব্দটি ওহী দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানকে বুঝায়।

খ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ.

অর্থ ঃ প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম তালাশ করা ফরয। (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

দুনিয়ার সব ইলম তালাশ করা ফরয নয়; কুরআন ও হাদীসের ইলম তালাশ করা ফরয। কারণ মুসলিম হিসেবে কালেমায়ে তাইয়েবার দাবি অনুযায়ী সব ক্ষেত্রেই আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। ওহীর ইলম হাসিল না করলে তা করা সম্ভব হবে না। যে এ ইলম শিখবে না, সে কাফিরের মতই জীবন যাপন করবে।

গ. কতটুকু ইলম হাসিল করা ফরয তা বুঝতে হবে। ৩০ পারা কুরআন ও লক্ষ লক্ষ হাদীসের ইলম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া কারো পক্ষেই আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

যার উপর যে দায়িত্ব পালন করা জরুরি, সে দায়িত্ব পালনের জন্য কুরআন ও হাদীসের যেটুকু জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন ততটুকু ইলমই ফরয।

প্রথম উদাহরণ ঃ যার উপর যাকাত দেওয়া ফরয নয় তার উপর যাকাত সম্পর্কিত ইলম হাসিল করা ফরয নয়। যার উপর যাকাত ফরয তাকে জানতে হবে যে, কোন্ মালের কত পরিমাণ যাকাত দিতে হবে এবং কোন্ কোন্ খাতে যাকাতের মাল খরচ করতে হবে।

দ্বিতীয় উদাহরণ ঃ যে পুরুষ ও নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল তাদের উভয়কেই জানতে হবে মুসলিম হিসেবে বিবাহিত জীবন কী নিয়মে যাপন করতে হবে। না জানলে কাফির স্বামী-স্ত্রীর মতই জীবন যাপন করবে। বিয়ের আগে তাদের উপর এ ইলম হাসিল করা ফরয ছিল না। বিবাহের পর যখন তারা সন্তানের পিতা-মাতা হবে তখন ঐ দায়িত্ব পালনের জন্যও প্রয়োজনীয় ইলম অর্জন করা তাদের উপর ফরয হবে।

তৃতীয় উদাহরণ ঃ যার উপর রাষ্ট্র পরিচালনা ও দেশ শাসনের দায়িত্ব পড়বে, সে যদি মুসলিম হয়ে থাকে তাহলে তাকে জানতে হবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দায়িত্ব কিভাবে পালন করেছেন। যদি সে এ ইলম হাসিল না করে তাহলে মুসলিম নামধারী হলেও কাফির শাসকদের মতই রাষ্ট্র পরিচালনা করবে।

www.pathagar.com

ঘ. কুরআন-হাদীসের যেটুকু জ্ঞান ফরয নয়, কেউ যদি নফল হিসেবে তা হাসিল করে তাহলে এর মূল্যায়ন কী? আমার উপর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেই। আমি এ বিষয়ে যেটুকু ইলম হাসিল করেছি তা আমার উপর ফরয ছিল না। আমার এ নফল ইলম অর্জনের কোন মূল্য আছে কিনা?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِّنْ إِحْيَائِهَا .

অর্থ ঃ রাতের কিছু সময় দীনের ইলম চর্চা করা সারা রাত জেগে অন্য ইবাদত করার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (দারেমী)

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সকল নফল ইবাদতের মধ্যে দীনের ইলম চর্চা করা সেরা ইবাদত।

তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত সব সময় তার সাথে ইসলামী সাহিত্য রাখা। তাহলে যখনই অবসর পাওয়া যায়, সে সময়টা শ্রেষ্ঠ নফল কাজে লাগানো যায়।

ঙ. এটাও জানা দরকার যে, পার্থিব বিভিন্ন জ্ঞানের কোন গুরুত্ব শরীআতে আছে কিনা? চিকিৎসাবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা ইত্যাদি মানব জীবনে অপরিহার্য। শরীআতের দৃষ্টিতে এ সব জ্ঞানের মর্যাদা কী?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ .

অর্থ ঃ হালাল রুজি তালাশ করাও অন্যান্য ফরযের পর একটি ফরয। (বায়হাকী)

এ হাদীসে হালাল রোজগার করার জন্য চেষ্টা করা ফরয বলা হয়েছে। বেঁচে থাকতে হলে জীবিকা অর্জন করতেই হবে। হালাল জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করা ফরয। এ ফরয আদায় করতে হলে কোন না কোন হালাল পেশা অবলম্বন করতে হবে।

যে যে পেশা গ্রহণ করবে সে পেশায় সফল হতে হলে তাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে হবে। যে চিকিৎসার পেশা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাকে এ বিদ্যা শিখতেই হবে। তার রোজগার হালাল হবে না, যদি সে চিকিৎসাবিদ্যা যথাযথ পরিমাণ না শিখেই এ পেশা চালায়। এ ব্যক্তির জন্য চিকিৎসাবিদ্যা ভালভাবে শিক্ষা করা পরোক্ষভাবে ফরয। তার জীবিকা হালাল করার জন্যই তা ফরয।

চ. পেশার উদ্দেশ্য ছাড়াও সখ করে কোন বিদ্যা শিক্ষা করা উচিত কিনা?

শরীআত যে সব কাজ হারাম করেছে, সে বিষয়ে জ্ঞানার্জনের চেষ্টা

www.pathagar.com

করাও হারাম। যে সব বিদ্যা হারাম কাজের শিক্ষা দেয় না। তা মুবাহ বা নির্দোষ। কেউ সখ করে এমন সব বিদ্যা শিখলে কোন দোষ হবে না, যদি তা নির্দোষ আনন্দ ও বিনোদন দান করে।

ছ. জ্ঞানের উৎস কী কী? ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, ইলহাম ও ওহী। শৈশব থেকেই প্রথম ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ শুরু হয়। ক্রমে বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। জ্ঞান সাধনার এক পর্যায়ে হঠাৎ করেও জ্ঞান আসে। ইংরেজিতে এর উৎসটিকে Intuition বলে। ওহীর জ্ঞান ছাড়া এ সব উৎসের জ্ঞান নির্ভুল না-ও হতে পারে। তাই ওহীর জ্ঞানের বিরোধী কোন জ্ঞানই গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. আমল বা চরিত্র

ক. আমল মানে কাজ। কাজের মাধ্যমেই চরিত্র সৃষ্টি হয়। শূন্যে চরিত্র সৃষ্টি হয় না। সমাজ থেকে দূরে নির্জনে যে বসবাস করে সে সত্যবাদীও নয়, মিথ্যাবাদীও নয়। সে কথাই বলে না। সমাজে বসবাসকারী কথা বলতে বাধ্য। সে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী হিসেবে গণ্য হবে। ভাল ও মন্দ চরিত্র কাজেরই ফসল।

খ. কাজের সূচনা হয় চিন্তায়। বাস্তবায়িত হয় ইচ্ছা করলে বা সিদ্ধান্ত নিলে এবং চেষ্টা করলে।

গ. কাজের সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ায় নাফস ও রূহের লড়াই চলে। এ লড়াইতে যে জয়ী হয় তার সিদ্ধান্তই কাল্‌ব বাস্তবায়ন করে।

দেহ দাবি জানায়। সে দাবি মন্দ হলে রূহ আপত্তি করে। এভাবে সুমতি ও কুমতির মধ্যে লড়াই চলে। শেষ পর্যন্ত যে বিজয়ী হয় তার দাবিই কাল্‌ব কার্যকর করে।

একটি উদাহরণ দেওয়া যায় ঃ সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে– আইন, শাসন ও বিচার। আইন বিভাগ কিছু করার জন্য আইন রচনা করে। ঐ আইন শাসনতন্ত্র বিরোধী হলে বিচার বিভাগ আপত্তি জানায়। এ দু'বিভাগের দ্বন্দ্বে যে জয়ী হয় শাসন বিভাগ তা-ই কার্যকর করে। মানুষের দেহ রাজ্যেও তিনটি বিভাগ আছে। নাফ্‌স হলো, আইন বিভাগ, রূহ হলো বিচার বিভাগ এবং কাল্‌ব হলো শাসন বিভাগ।

ঘ. কোন কাজ সমাধা করা বা সম্পন্ন করার কোন এখতিয়ার মানুষের নেই। কাজের ইচ্ছা করা ও চেষ্টা করার এখতিয়ারই শুধু আছে। কাজ সমাপ্ত হওয়া বা না হওয়া আল্লাহর ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

ঙ. মানুষের যেটুকু এখতিয়ার আছে তা করা হলে, কাজ সমাধা না হলেও ঐ কাজের পুরস্কার বা শাস্তি পাবে। কোন কাজ সমাধা হওয়ার উপর

www.pathagar.com

পুরস্কার বা শাস্তি নির্ভর করে না। ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কাজ করার চেষ্টা করা হলেই কাজটি করা হয়েছে বলে ধরা হবে। এক ব্যক্তি হজ্জ করার ইচ্ছা করল এবং চেষ্টা স্বরূপ রওয়ানা হয়ে গেল। পথে সে মারা গেল। সে হজ্জ করেছে বলে ধরা হবে। তার যতটুকু এখতিয়ার ছিল তা সে করেছে। তাই সে হজ্জের পুরস্কার পাবে। এক ব্যক্তি একজনকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে শাবল হাতে নিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হল। দু'জন লোক তাকে ধরে ফেলল এবং শাবল কেড়ে নিল। যদিও সে তাকে ছুঁতে পারেনি তবু আদালতে শাস্তি পাবে। 'Intentionally attempted to commit murder' এ কথা প্রমাণিত হলেই সে শাস্তি পাবে।

এক ব্যক্তি পাখি শিকার করার উদ্দেশ্যে গাছে গুলি করল। গাছে এক লোক ছিল। গুলিতে সে লোক মারা গেল। হত্যার কাজটা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আদালতে যদি প্রমাণিত হয় যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার চেষ্টা করেনি তাহলে কোন শাস্তি হবে না।

আদালতে আখিরাতেও আমলের বিচার এ নিয়মেই হবে। ইচ্ছা বা নিয়ত এবং চেষ্টা করা হলেই কাজটি করা হয়েছে বলে ধরা হবে। কাজটি ভাল হলে পুরস্কার এবং মন্দ হলে শাস্তি পাবে।

চ. কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করলেও সে কাজের জন্য চেষ্টা না করা পর্যন্ত কোন শাস্তি দেওয়া হবে না। কিন্তু কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করলে চেষ্টা করার সুযোগ না পেলেও কিছু পুরস্কার পাবে। এটা হল মেহেরবান আল্লাহর বিশেষ কনসেশন।

ছ. সহীহ নিয়ত ব্যতীত নেক আমলও কবুল হয় না। সহীহ নিয়ত মানে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাফল্যের নিয়তে কাজ করা। এ নিয়ত ছাড়া আমলের কোন সওয়াব পাওয়া যাবে না।

জ. ভাল ও মন্দ কাজের জের মৃত্যুর পরও বাকি থাকে। কোন ভাল কাজের সুফল যদ্দিন জারি থাকবে তদ্দিন আমলনামায় তা যোগ হতে থাকবে। তেমনি মন্দ কাজের কুফলও জমা হতে থাকবে। তাই মৃত্যুর সাথে সাথেই সব আমল শেষ হয়ে যায় না এবং তার হিসাব চূড়ান্ত হয় না।

হাশরের ময়দানে মানুষ যখন আমলনামা হাতে পাবে তখন নেক ও বদ লোকদের অনেকেই বলে উঠবে, "ইয়া আল্লাহ আমি তো এত কিছু করিনি, যা আমার আমালনামায় আছে।" এর জওয়াবে বলা হবে, তোমার মৃত্যুর পরও তোমার যে সব আমল জারি ছিল তাও এতে যোগ হয়েছে। ভাল বা মন্দ কাজ যা অন্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছ বা অন্যরা তোমার অনুকরণ করে যে সব কাজ করেছে তাও তুমি করেছ বলে ধরা হয়েছে।

www.pathagar.com

পরিবার গঠনের দায়িত্ব

আল্লাহ তাআলা পরিবারকে মানুষ গড়ার কারখানা বানিয়েছেন। পিতামাতা ও অন্যান্য স্নেহপরায়ণ আপনজনরা পারিবারিক ঘনিষ্ঠ পরিবেশে স্নেহ-মমতার আবেগ দিয়ে শিশুদেরকে লালন-পালন করে। পিতামাতার উপর আল্লাহ দায়িত্ব দিয়েছেন যেন তারা সন্তানদেরকে আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ-বান্দী হিসেবে গড়ে তোলে।

পরিবারকে একটি সংস্থা (Institution) হিসেবে আল্লাহ তাআলা এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তিনি পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্থ রাখার উদ্দেশ্যে বিস্তারিত আইন দিয়েছেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শুধু মৌলিক আইন দিয়ে মানুষকে এর ভিত্তিতে বিস্তারিত আইন রচনার দায়িত্ব দিয়েছেন। কিন্তু পারিবারিক সংস্থার জন্য পরিপূর্ণ বিধান দিয়েছেন। পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক আবেগনির্ভর। তাদের নিকট এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব দেওয়া নিরাপদ নয়। কারণ সম্পর্ক ভাল থাকলে আবেগতাড়িত হয়ে পাওনা হকের চেয়েও বেশি দিয়ে ফেলবে। আর সম্পর্ক খারাপ হলে ন্যায্য অধিকারও দেবে না।

দুটো বাস্তব উদাহরণ, যা সরাসরি আমার জানা

১. স্বামী ভালবাসার আতিশয্যে নিজের বাড়িটা স্ত্রীকে লিখে দিল। মনোমালিন্যের এক পর্যায়ে স্ত্রী স্বামীকে বাড়িতে ঢুকতে দিল না। এরশাদের সামরিক শাসনামলে এ ঘটনা ঘটে। স্বামী বাড়িতে ঢুকবার চেষ্টা করলে স্ত্রী সামরিক আইনে গ্রেপ্তার করাতে সক্ষম হয়।

২. ইসলামী আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তার অমতে বিয়ে করায় ছেলেকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করা যায় কিনা সে বিষয়ে আমার পরামর্শ চাইলেন। বললাম, "ছেলে কাফির না হওয়া পর্যন্ত তা করা যাবে না। ছেলেকে আপনি বাড়িতে আসতে না দিলেও দোষ হবে না। কিন্তু আপনার মৃত্যুর পর সে ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য হবে এবং সম্পত্তি পাবে।

আল্লাহর দেওয়া পারিবারিক আইনে নতুন কোন ধারা যোগ করার কোন ফাঁকও নেই। ইসলামী সরকার দেশে না থাকায় এবং ইসলামী পারিবারিক আইন সঠিকভাবে চালু না থাকায় যে সমস্যার সৃষ্টি হয় এর সমাধানের দোহাই দিয়ে ১৯৬১ সালে স্বৈরশাসক আইয়ুব খান অর্ডিন্যান্স বলে ইসলামী পারিবারিক আইন সংশোধন করে পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধিই করেছেন। অথচ ব্রিটিশ শাসকরাও মুসলিমদের পারিবারিক আইনে হাত দিতে সাহস করেনি।

www.pathagar.com

আল্লাহর খিলাফত কায়েমের পদ্ধতি

মানব জাতির শান্তি, শৃঙ্খলা ও সার্বিক কল্যাণের জন্য আল্লাহ তাআলা যে জীবন বিধান পাঠালেন, তা মানব সমাজে বাস্তবে চালু করার দায়িত্বই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া হয়েছে বলে কুরআনে সূরা আত-তাওবার ৩৩ নং, সূরা আল-ফাতহের ২৮ নং এবং সূরা আস্-সাফ্ফের ৯ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লাহর রচিত ঐ বিধান অনুযায়ী মানব জাতিকে পরিচালনার দায়িত্ব আল্লাহ নিজে পালন না করে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর পক্ষ থেকে তা করার যে দায়িত্ব দিলেন সেটাই খিলাফতের দায়িত্ব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৩ বছর এর প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। ১৩ বছরে এমন এক জামায়াত লোক তৈরি করলেন, যারা আল্লাহর রচিত জীবন বিধানকে মানব সমাজে চালু করার যোগ্য। এ রকম এক দল লোক তৈরি হবার পর তিনি মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করলেন। তাঁরই নেতৃত্বে ইসলামী সরকার ১০ বছরে একটি আদর্শ মানব সমাজ গঠন করে আল্লাহর খিলাফত কায়েম করতে সক্ষম হলো।

কিয়ামত পর্যন্ত যারাই আল্লাহর খিলাফত কায়েমের ফরযটি পালন করতে চায়, তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো পদ্ধতিতেই একদল সালেহ (সৎ ও যোগ্য) লোক তৈরি করতে হবে। তাই লোক তৈরির ঐ পদ্ধতিটি সঠিকভাবে জানতে হবে।

সূরা আন নূরের ৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন যে, মুমিন ও সালেহ লোকদের একটি জামায়াত তৈরি করা হলে, তিনি তাদের হাতে অবশ্যই খিলাফতের ক্ষমতা তুলে দেবেন। এমন একদল লোক তৈরি করার দায়িত্ব আল্লাহ নিজে গ্রহণ করেননি। লোক তৈরি করা হলে তাদেরকে ক্ষমতাসীন করার দায়িত্ব তিনি নিলেন।

লোক তৈরির পদ্ধতি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পদ্ধতিতে লোক তৈরি করেছেন, ঐ পদ্ধতিটি স্বয়ং আল্লাহই শিক্ষা দিয়েছেন। এ পদ্ধতি খুবই যুক্তিসঙ্গত। এ পদ্ধতির পয়লা কাজ হলো দাওয়াত। যারা দাওয়াত কবুল করে তাদেরকে সংগঠিত করা হলো দ্বিতীয় কাজ।

দাওয়াত

সকল নবী সহজ-সরল ভাষায় মানুষের নিকট একই দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। সূরা আল-আ'রাফের ৮ম রুকু থেকে পর পর কয়েক রুকুর শুরুতে এক

www.pathagar.com

একজন নবীর নাম নিয়ে নিম্নরূপ ভাষায় দাওয়াত দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ

"হে আমার দেশবাসী! একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য আর কোন হুকুমকর্তা নেই।" (আল-আরাফ ৬৫)

এ দাওয়াতে কোন অস্পষ্টতা নেই। এতে কোন জটিল যুক্তি নেই। এতে বলা হয়েছে ঃ তোমাদের হুকুমকর্তা মনিব একমাত্র আল্লাহ। তোমরা শুধু তাঁরই হুকুম মেনে চল। তোমাদের উপর আর কারো মনিব হওয়ার অধিকার নেই। তোমরা মানুষ। অন্য কোন মানুষ তোমাদের হুকুমকর্তা হবে কেন? তোমরা অন্য মানুষের দাসত্ব করবে কেন? তোমরা একমাত্র আল্লাহর দাস। যিনি তোমাদের স্রষ্টা, তোমাদের মনিব হওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁরই। এ অধিকার কেউ দাবি করলে তা তোমরা মানতে রাজি হবে কেন?

নবীর এ দাওয়াতের মর্মকথা দেশের নেতা ও কর্তাদের বুঝতে ভুল হয়নি। তারা বুঝতে পেরেছিল বলেই নবীর বিরোধিতা করা জরুরি মনে করেছে। সব নবীই মানুষ হিসেবে দেশের সেরা বলে জনগণের নিকট পরিচিত ছিলেন। তাই তাঁদের দাওয়াতের প্রভাব জনগণের মধ্যে দ্রুত বিস্তার লাভ করাই স্বাভাবিক। তাই দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ নবীর দাওয়াতকে তাদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ বলে মনে করল। তারা বুঝতে পারল যে, জনগণ এ দাওয়াত কবুল করলে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব থাকবে না; নবীর নেতৃত্বই কায়েম হয়ে যাবে। তাদের পরিচালনায় দেশে যে সব আইন ও সমাজ-ব্যবস্থা চালু আছে তা বদলে যাবে। প্রচলিত ব্যবস্থায় তাদের স্বার্থ কায়েম আছে। তাদের এ কায়েমী স্বার্থ খতম হয়ে যাবে। নবীগণের এ দাওয়াত শুধু ধর্মীয় দাওয়াত ছিল না, শুধু আখিরাতে মুক্তির দাওয়াত ছিল না, বাতিল নেতৃত্বের অধীনে নিরিবিলি ধর্ম চর্চার দাওয়াতও নবীগণ দেননি। যদি তাঁদের দাওয়াত বাতিল নেতৃত্বের জন্য চ্যালেঞ্জ না হত, তাহলে কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাঁদের বিরোধিতা করত না। নবীদের দাওয়াত সমাজ বিপ্লবের এবং নেতৃত্বের পরিবর্তনের দাওয়াত।

সংগঠন

যারা নবীর দাওয়াত কবুল করেছেন তারাই ঘোষণা করেছেন ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিলাম যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ বা হুকুমকর্তা নেই।

অর্থাৎ আমি দেশের সকল নেতা ও কর্তাকে মানতে অস্বীকার করলাম। আমি শুধু আল্লাহকেই হুকুমকারী প্রভু মেনে নিলাম। তাঁর হুকুমের বিরোধী কারো হুকুমই আমি মানব না।

www.pathagar.com

যারাই নবীর দাওয়াত কবুল করার হিম্মত করলেন, তাদেরকে নবী সংগঠনভুক্ত করার ব্যবস্থা করলেন। সূরা আল-আ'রাফে যে নবীদের নাম উল্লেখ করে ঐ দাওয়াতের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সূরা শুআ'রায় ঐ নবীগণের নাম উল্লেখ করেই বলা হয়েছে যে, তাঁরা একই ভাষায় সংগঠনভুক্ত হবার ডাক দিয়েছেন। তা হলো ঃ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল এবং আমার আনুগত্য কর। (আশ-শুআরা ১০৮) অর্থাৎ আমার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে আমার সংগঠনভুক্ত হও।

আল্লাহ তাআলা কোন অযোগ্য লোককে নবী নিযুক্ত করেন নি। কিন্তু নবী যত যোগ্যই হোক তাঁদেরকে সমাজ পরিবর্তনের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা সামাজিক প্রচেষ্টা ছাড়া সম্ভব নয়। এ কাজ ফুঁ-দিয়ে করে ফেলা যায় না বা অলৌকিক উপায়ে হয় না; এর জন্য সংগঠন অপরিহার্য।

কায়েমী স্বার্থ ও নেতৃত্ব সংগঠনকেই সবচেয়ে বেশি ভয় পায়। তাই তারা জুলুম-নির্যাতন আর জনগণকে ভীত করে দেয়, যাতে নবীর সংগঠনে কেউ না যায়। এতে ভীত লোকেরা আপনিতেই বাদ পড়ে যায়। একমাত্র সাহসী লোকেরাই নবীর সংগঠনভুক্ত হয়। এটাই লোক বাছাই করার স্বাভাবিক পদ্ধতি।

লোক তৈরির কর্মসূচি

যারা দাওয়াত কবুল করে সংগঠনভুক্ত হলেন তাদেরকে ইসলামী বিপ্লবের উপযোগী করে গড়ে তুলবার জন্য আল্লাহ তাআলা চার দফা কর্মসূচি দিয়েছেন। সূরা আল-বাকারার ১২৯ ও ১৫১ আয়াত, সূরা আলে ইমরানের ১৬৪ আয়াত ও সূরা আল-জুমুআর ২ নং আয়াতে ঐ চার দফা কর্মসূচি পেশ করা হয়েছে।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ -

অর্থ ঃ হে আমাদের রব, তাদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠান, যে তাদের নিকট আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। (আল বাকারা ঃ ১২৯)

ঐ চারটি দফা হল ঃ

১. কুরআন তিলাওয়াত বিশুদ্ধভাবে শিক্ষা দেওয়া।

২. কুরআনের অর্থ শিক্ষা দেওয়া।

৩. হিকমত শিক্ষা দেওয়া।

৪. তাযকিয়া সাধন করা বা ত্রুটিমুক্ত করে পবিত্র করা।

এ চারদফা হল ইতিবাচক কর্মসূচি। এর সাথে নেতিবাচক কর্মসূচিও রয়েছে, যার আলোচনা পরে আসবে।

www.pathagar.com

ইতিবাচক চার দফার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

প্রথম দফা

কুরআন বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা শেখানো। জিবরাঈল (আ) আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআন কিছু কিছু করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিলাওয়াত করে শুনাতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সাহাবায়ে কেরামকে শুনাতেন। বিশুদ্ধ উচ্চারণে তারতীলের সাথে কুরআন পড়তে হয়। ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করাকেই তারতীল বলে। উচ্চারণ সঠিক না হলে অর্থ বিকৃত হয়ে যায়। আরবী অক্ষরগুলোর উচ্চারণ অশুদ্ধ হলে তিলাওয়াতের সওয়াবের বদলে গোনাহ হবারই আশঙ্কা রয়েছে। বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণে কুরআন পড়াকে তাজবীদ বলা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন সুর করে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা গানের সুরের মত তাল ও লয়বিশিষ্ট নয়।

দ্বিতীয় দফা

কুরআনের অর্থ শেখানো। কুরআন হেদায়াতের জন্য নাযিল হয়েছে। অর্থ না বুঝলে হেদায়াত কী করে পাবে? আরবী ভাষাজ্ঞানের ভিত্তিতে কোন ভাষাবিদ কুরআনের ব্যাখ্যা করলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা করার দায়িত্বও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দেওয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাখ্যার সাথে খাপ খায় না এমন কোন ব্যাখ্যা সঠিক বলে গণ্য নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনই আসল কুরআন, বাস্তব কুরআন ও জীবন্ত কুরআন। কুরআনকে বিশুদ্ধভাবে বুঝতে হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকেই বুঝতে হবে।

৩০ পারা বিরাট কুরআন আমরা বই হিসেবে দেখি। কিন্তু কুরআন বই-এর আকারে নাযিল হয়নি। আল্লাহর খিলাফত কায়েমের যে বিরাট দায়িত্ব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিল, সে দায়িত্ব পালনের জন্য যখন যে পরিমাণ নাযিল করা দরকার, সে পরিমাণই নাযিল করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাগণ ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালনকালে যখন কুরআনের যে অংশ নাযিল হত তা আন্দোলনের প্রয়োজন পূরণ করত বলেই এর অর্থ সহজেই বুঝে নিতেন। তারা যে অর্থ বুঝতেন সেটাই সঠিক অর্থ। কুরআনের ঐ অর্থ বুঝতে হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনভিত্তিক তাফসীর পড়তে হবে। কুরআনের ঐ শিক্ষা যারা অর্জন করে তারাই খিলাফতের দায়িত্ব পালনের যোগ্য হয়।

তৃতীয় দফা

হিকমত শিক্ষা দেওয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই হিকমত শব্দের অর্থ করেছেন 'তাফাক্কুহ ফীদ্দীন'। তাফাক্কুহ শব্দটি ফিক্হ শব্দ থেকেই

www.pathagar.com

গঠিত। তাফাক্কুহ মানে বুঝা, অনুধাবন করা। 'তাফাক্কুহ ফীদ্‌দীন' মানে দীন সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা। যে পরিমাণ জ্ঞান লাভ করলে জীবন চলার পথে কুরআনের আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্যতা হয় তা-ই তাফাক্কুহ ফীদ্‌দীন। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী হিসেবে দীনের সঠিক জ্ঞানার্জন করার সুযোগ পেতেন। সাহাবাগণকে এ শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্বও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরই ছিল।

চতুর্থ দফা

'ইউযাক্কীহিম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। زَكّٰى (যাক্কা) মানে পবিত্র করা। تَزْكِيَةٌ (তাযকিয়াতু) অর্থ পবিত্রকরণ, পবিত্রতা সাধন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। তাদের কথা, কাজ, অভ্যাস, আচরণ ইত্যাদিতে আল্লাহর অপছন্দনীয় কিছু লক্ষ্য করলে তাদেরকে সংশোধন করে ঐ সব থেকে পবিত্র করে দিতেন। এ জন্যই সাহাবীগণের মধ্যে যা কিছু প্রচলিত ছিল এর মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা সংশোধন করেননি তা সঠিক বলে গণ্য। পরিভাষায় এ সবকে 'তাকরীর' বলা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিষয়ে কোন আপত্তি করেননি তা অনুমোদিত বলে গণ্য। এ জন্যই তাকরীরকে বাংলায় অনুমোদন বলা হয়। এটাও হাদীস হিসেবে গণ্য।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার মাধ্যমেই ঐ চারদফা কর্মসূচি সংগঠনভুক্তদের জীবনে বাস্তবায়িত হয়।

যারাই ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে সংগঠন গড়তে চান তাদেরকে ঐ চার দফা কর্মসূচি অনুযায়ীই লোক তৈরি করতে হবে।

নেতিবাচক কর্মসূচি

আগেই বলা হয়েছে যে, নবীর দাওয়াত এমনই স্পষ্ট যে, সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব তাদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ঐ দাওয়াত ও সংগঠনকে বরদাশত করতে পারে না। তাদের বিরোধিতা ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অপপ্রচার দ্বারাই শুরু হয়। পরে জুলুম ও নির্যাতন করে মানুষকে এ পথে অগ্রসর হতে বাধা দেওয়া প্রয়োজন মনে করে।

এ পরিস্থিতিতে নবী চরম ধৈর্য ও সাহসের সাথে আন্দোলনের তৎপরতা চালিয়ে যান এবং সংগঠনভুক্ত সবাইকে বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করেন। নবীর দৃঢ়তা সবার প্রেরণার উৎস হয়ে সবাইকে বলিষ্ঠ ভূমিকায় অবতীর্ণ করে।

www.pathagar.com

এ নেতিবাচক কর্মসূচি লোক তৈরির জন্য অত্যন্ত সহায়ক। যে দেশে মানুষের মনগড়া শাসন ও সমাজব্যবস্থা চালু আছে, সেখানে ঐ ব্যবস্থা উৎখাত করে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এ পরিবেশেই ইসলামী আন্দোলনের জন্য উপযোগী লোক বাছাই করা সহজ। কারণ প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও যারা দীনের সংগঠনে টিকে থাকে তারাই আন্দোলনের উপযোগী। যারা বিরোধী শক্তির দাপটে সরে যায় তারা মোটেই এর উপযোগী নয়। এভাবেই অনুপযোগী লোক আপনিতেই ছাটাই হয়ে যায়। যারা টিকে থাকে তারা এ বিরোধিতার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে ঐ সব গুণের অধিকারী হয়, যা সমাজ পরিবর্তনের জন্য জরুরি।

হক ও বাতিলের এ লড়াই যোগ্য লোক বাছাই করা ও গড়ে তুলবার জন্য অপরিহার্য। আল্লাহর মুখলিস বান্দাহদেরকে এভাবেই গড়ে উঠার ব্যবস্থা দিয়েছেন। এটা আল্লাহর কোন শখের খেলা নয়। এ পদ্ধতি ছাড়া দীন কায়েমের যোগ্য লোক বাছাই করা অসম্ভব।

যাঁরা ১৩ বছর বাতিল শক্তির হাজারো অন্যায়-অবিচার সহ্য করে আল্লাহর দীনের আন্দোলনে টিকে রইলেন তাঁরা এ কথাই প্রমাণ করলেন যে, তাঁরা আল্লাহর সৈনিক, তাঁরা নাফসের গোলাম নন; তারা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পর যখন সকল ঈমানদারের উপর চূড়ান্ত পরীক্ষা আসল, তখন সবাইকে হিজরত করার নির্দেশ দেওয়া হল।

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হল। এ রাষ্ট্রটি পরিচালনার জন্য এমন লোকদেরই বেশি প্রয়োজন, যারা আল্লাহর খিলাফত কায়েমের যোগ্য। রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্য লোকদের এমন কতক গুণের অধিকারী হওয়া জরুরি, যা না থাকলে দুর্নীতিমুক্ত শাসন কায়েম হতে পারে না। সরকারি ক্ষমতা যাদের হাতে থাকে তারা সহজেই অন্যায় ও অবৈধ উপায়ে সম্পদ আহরণ, স্বজনপ্রীতি ও জনগণের অধিকার হরণ করতে পারে। এ সব দোষ থেকে মুক্ত লোকের হাতে শাসনক্ষমতা না থাকলে দেশে সুশাসন কায়েম হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে একদল নৈতিক গুণাবলি সম্পন্ন লোক পেয়েছিলেন বলেই ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ সরকার মানব জাতিকে উপহার দিতে সক্ষম হলেন। এ জাতীয় লোক তিনি কিভাবে যোগাড় করলেন? এ সব কি সমাজে রেডিমেড পাওয়া যায়? তিনি কি এ লোকদেরকে বিদেশ থেকে আমদানি করেছিলেন?

প্রকৃত সত্য এটাই যে, বাতিল শক্তির জুলুম-নির্যাতনের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই সৎ ও যোগ্য লোকদের ঐ বাহিনী তৈরি হয়েছিল। দীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাফল্যের মহান উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করতে গিয়ে

www.pathagar.com

যাঁরা দুনিয়ার সবকিছু ত্যাগ করতে সক্ষম হলেন, দুনিয়ার স্বার্থে নৈতিকতা বিরোধী কাজ করা তাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়।

যাঁরা দীনের স্বার্থে বাড়িঘর, সহায়-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন এমনকি জন্মভূমি পর্যন্ত ত্যাগ করে মদীনায় এসে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন তাঁরা কি অবৈধ উপায়ে সম্পদ হাসিল করতে পারেন? তাঁরা কি স্বজনপ্রীতি করতে পারেন? সম্পদের লোভ থাকলে কি তাঁরা নিজেদের সম্পদ ত্যাগ করে হিজরত করতে পারতেন? স্বজনদেরকে যাঁরা দীনের খাতিরে ত্যাগ করলেন, তাঁদের পক্ষে স্বজনপ্রীতি করা কি সম্ভব? তাঁরা তো দীনের স্বার্থে সব কিছুই ত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, শুধু দীনকে ত্যাগ করতেই তাঁরা অক্ষম, দীনের প্রয়োজনে আর সব কিছু ত্যাগ করতে তাঁরা পূর্ণরূপে সক্ষম।

ঐ লোকগুলো আসমান থেকে নাযিল হয়নি। ঐ সমাজ থেকেই বের হয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতে তাঁরা সাড়া দিয়ে সংগঠনভুক্ত হয়েছেন। বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে সকল প্রকার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে খাদমুক্ত খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছেন।

এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হল যে, লোক তৈরির জন্য শুধু ইতিবাচক কর্মসূচিই যথেষ্ট নয়, নেতিবাচক কর্মসূচিও অপরিহার্য। এটাই চিরন্তন কর্মসূচি। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পর্যন্ত যে পদ্ধতি অবলম্বন করতে বাধ্য হতে হয়েছে, সে পদ্ধতি ছাড়া শুধু দোয়ার জোরে ও কেরামতির মাধ্যমে দীনকে বিজয়ী করা কিছুতেই সম্ভব নয়। বাতিলের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে দীনের কিছু খিদমত করা যায়, দীন কায়েম করা যায় না।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে খিলাফতের দায়িত্ব

আল্লাহ তাআলা সূরা আল হাজ্জের ৪১ আয়াতে ইসলামী রাষ্ট্রের চার দফা কর্মসূচি দিয়েছেন।

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

অর্থ ঃ (তারা এমন লোক) যাদেরকে আমি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করে, ভাল কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।

কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে এ চার দফা কর্মসূচির যে উদ্দেশ্য জানা যায়, এর ভিত্তিতে দফাগুলোর নিম্নরূপ নামকরণ করা যায়।

www.pathagar.com

১. নামাযের মাধ্যমে জনগণের চরিত্র গঠন করা।
২. যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি চালু করে জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা।
৩. যাবতীয় কল্যাণমূলক কাজ চালু করা।
৪. সকল অনিষ্টকর কাজ বন্ধ করা।

প্রথম দফা ঃ চরিত্র গঠন করা

মানব সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সবারই কাম্য। সমাজের মানুষগুলো যদি চরিত্রবান হয় তবেই এ কামনা পূরণ হতে পারে। বিনা পরিকল্পনা ও বিনা চেষ্টায় চরিত্রবান লোক তৈরি হয় না। বিনা চেষ্টায় এমনি এমনি জঙ্গাল সৃষ্টি হয়, বাগান তৈরি হয় না।

আমাদের দেশে শুধু নয়, প্রায় সব দেশেই সরকারি উদ্যোগে চরিত্রবান লোক তৈরির কোন ব্যবস্থা নেই। শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে পার্থিব জ্ঞান দান করা হয় মাত্র; চরিত্র গঠনের কোন পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয় না।

চরিত্র মানে কী? বিবেকের নির্দেশ মেনে চললে যে আচরণ প্রকাশ পায় এরই নাম চরিত্র। বিবেক কী? ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও মিথ্যা, সততা ও অসততা, কল্যাণ ও অকল্যাণ, ক্ষতিকর ও উপকারী, ঠিক ও বেঠিক ইত্যাদি ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে যে চেতনাবোধ দিয়েছেন এরই নাম বিবেক। এটাই আসল মানুষ। কুরআনের ভাষায় এরই নাম রূহ। এটাই মানুষের নৈতিক সত্তা। মানব দেহ অন্যান্য পশুর মতই নৈতিক চেতনাহীন।

দেহ মানুষের বস্তুসত্তা। বস্তুজগতের প্রতি তার প্রবল আকর্ষণ। বস্তুজগৎকে ভোগ করার তীব্র চাহিদা দেহের রয়েছে। বিবেক ও নৈতিক সত্তার নিয়ন্ত্রণ না থাকলে দেহ পশুর চেয়েও অধম হতে পারে।

খিলাফতের প্রথম দায়িত্ব হল সরকারি প্রচেষ্টায় জনগণকে নৈতিক জীব হিসেবে গড়ে তোলা। এর জন্য নামায শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। চরিত্র গঠনের জন্য প্রয়োজন ঃ

১. আল্লাহ আমাকে সব সময় দেখছেন এবং তিনি আমার গোপন কথাও জানেন—এ চেতনা।
২. আখিরাতে আমাকে প্রতিটি কাজের বদলা পেতে হবে—এ বিশ্বাস।

নামায ঐ চেতনা ও বিশ্বাসকে লালন করে বলেই এটি চরিত্র গঠনে সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থ ঃ নিশ্চয় নামায অশ্লীলতা ও মন্দ থেকে ফিরিয়ে রাখে। (আনকাবুত ৪৫)

www.pathagar.com

যাদের জীবনে নামায শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান, তাদের নামায চরিত্র গঠনে অক্ষম।

[দ্রষ্টব্য ঃ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে লেখকের 'জীবন্ত নামায' বইটি পড়ুন।]

সরকারের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হল সমাজে আইন-শৃঙ্খলা কায়েম করে জনগণের জান-মাল-ইজ্জতের হেফাযত করা। সরকার পরিচালনার দায়িত্ব চরিত্রবান লোকদের হাতে না থাকলে আইনের যথাযথ প্রয়োগ হয় না।

আমাদের দেশে মানুষের জান-মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তার যে অভাব রয়েছে, এর মূল কারণই অসৎ লোকের শাসন। যাদের উপর আইন প্রয়োগের দায়িত্ব তারা সৎ নয়। কারণ তাদেরকে সৎ বানাবার ব্যবস্থাই নেই। তাদের মধ্যে কিছু লোক সৎ থাকতে চাইলেও টিকতে পারে না।

চরিত্রবান লোকের শাসন কায়েম না হলে জনগণকে চরিত্রবান বানাবার কাজ কে করবে? সৎ লোকের শাসন কায়েম না হলে ভাল আইনও অকেজো হয়ে থাকে। সৎ লোকের দ্বারা সরকার পরিচালিত না হলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা কিছুতেই বহাল থাকতে পারে না।

দ্বিতীয় দফা ঃ জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ

সরকারের দ্বিতীয় প্রধান দায়িত্ব হল মানুষ হিসেবে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার জন্য জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা। মুসলিম শাসকদের এ কর্তব্য পালন করাটাই খিলাফতের দ্বিতীয় দফা দায়িত্ব।

সূরা আল-বাকারার ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ـ

অর্থ ঃ তিনিই ঐ সত্তা, যিনি তোমাদের জন্যই পৃথিবীর সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন।

এ আয়াতটি ঐ সূরার তৃতীয় রুকুতে রয়েছে এবং ঐ রুকুর শুরুতে يَا اَيُّهَا النَّاسُ বলে গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ভাষায় জানালেন যে, পৃথিবীর সব কিছু মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। গোটা সৃষ্টি জগতে যা কিছু আছে এ সবই মানুষের জন্য। মানুষকে আর কোন সৃষ্টির জন্য পয়দা করা হয়নি। মানুষই সৃষ্টির সেরা।

গাছ-পালা, পশু-পাখি, আগুন-পানি সবই মানুষের খেদমতের লাগে। এ সব ছাড়া মানুষের চলে না। কিন্তু মানুষ না হলে এ সবের কোন অসুবিধা নেই; বরং সুবিধা। এতেই প্রমাণিত হয় যে, এ সবই মানুষের জন্য। মানুষ এ সবের জন্য

www.pathagar.com

নয়। মানুষ মরে গেলে তার দেহের গোশত, চর্বি, হাড় অন্যান্য পশুর দেহের মত ব্যবহার করার অনুমতি নেই। মৃত্যুর পরও মানব-দেহকে সম্মানের সাথে কাপড় মুড়ি দিয়ে কবরস্থ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সৃষ্টি জগৎকে ব্যবহার করার এখতিয়ার শুধু মানুষকেই দেওয়া হয়েছে। কারণ খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য এটা অত্যন্ত জরুরি। তাই মানুষই শুধু বিজ্ঞান চর্চা করার যোগ্য এবং প্রাকৃতিক যাবতীয় শক্তিকে কাজে লাগাবার অধিকারী। জিন জাতিকে খিলাফতের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি বলেই তাদের বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন জাগে, মানুষকে এত বড় মর্যাদা দেওয়া সত্ত্বেও মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয় না কেন? বিশ্বের সব কিছু যাদের জন্য পয়দা করা হল তাদের এত অভাব কেন?

সূরা হূদের ৬ নং আয়াতে (১২ পারার পয়লা আয়াত) বলা হয়েছে ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا ـ

অর্থ ঃ দুনিয়ায় এমন কোন প্রাণী নেই, যার রিয্কের দায়িত্ব আল্লাহ নেননি।

অর্থাৎ সকল জীবের রিয্কের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন। আমরা এ কথার সত্যতা বাস্তবে প্রমাণিত দেখতে পাচ্ছি। পিঁপড়া থেকে হাতি পর্যন্ত, ফড়িং থেকে উটপাখি পর্যন্ত সকল পশু-পক্ষী, কীটপতঙ্গ প্রয়োজনীয় জীবিকা পাচ্ছে। বনে-জঙ্গলে কোথাও কোন প্রাণী অভুক্ত নেই। রিয্কের অভাবে কোন প্রাণী শুকিয়ে মরে যেতে দেখা যায় না। অবশ্য আমাদের গৃহপালিত পশু-পক্ষীর কথা আলাদা। এদের দায়িত্ব আমাদের; আল্লাহর নয়। আল্লাহর রাজ্যে সকল প্রাণীই রিয্ক পাচ্ছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, সত্যি সত্যিই আল্লাহ তাআলা রিয্কের দায়িত্ব নিয়েছেন।

এখন ঐ প্রশ্নটা আরও বড় হয়ে দেখা দিল যে, মানুষ কি প্রাণী নয়? আল্লাহ সব প্রাণীর রিয্কের দায়িত্ব নিলেন, মানুষের দায়িত্ব নিলেন না কেন? কোন প্রাণীর অভাবে কষ্ট পেতে হয় না, মানুষকে কেন কষ্ট পেতে হয়?

এ প্রশ্নের সঠিক জওয়াব এটাই যে, সকল প্রাণীর রিয্কের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই পালন করেন। কিন্তু মানুষের বেলায় এ দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে পালনের জন্য আল্লাহর খলীফাদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। মানব সমাজকে পরিচালনা করার বিধান আল্লাহই রচনা করেছেন, মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য উৎপাদন ও বণ্টনের মূলনীতি তিনিই নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব মানুষের উপরই অর্পণ করেছেন। এ দায়িত্বটি খিলাফতের দ্বিতীয় দায়িত্ব। মানুষ এ দায়িত্ব পালন করছে না বলেই অনেক মানুষ রিয্কের অভাবে কষ্ট পায়।

খিলাফতের এ বিরাট দায়িত্বটি পালন করার জন্যই যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি

www.pathagar.com

চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশ্বে বর্তমানে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে, তা হচ্ছে সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থাটি আসলেই শোষণমূলক। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়ে গেছে বলে রাশিয়া ও চীনে আবার পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই চালু হতে চলেছে।

যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি পুঁজিবাদী শোষণমূলক অর্থনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থা। যাকাতের স্পিরিট বা দৃষ্টিভঙ্গিই হচ্ছে শোষণের বিপরীতে ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি।

যাকাতের শিক্ষা

১. ধনের আসল মালিক আল্লাহ। তাই হালাল পথে আয় করতে হবে এবং হালাল পথেই খরচ করতে হবে। কারণ যাকাত হালাল উপায়ে অর্জিত আয় থেকেই দিতে হয়।

২. আল্লাহর হুকুমে যাকাত দেবার পর যে মাল ধনীর হাতে থাকে তাও আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজে খরচ করা চলবে না।

৩. ধনীদের সম্পদে গরীবদের হক রয়েছে বলে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। সমাজের অভাবীদের হক আদায় করার জন্যই যাকাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এভাবেই যাকাত মানুষকে শোষণ করার বদলে মানুষের জন্য ত্যাগ করার প্রেরণা যোগায়। যাকাত শুধু ধনীদের বছরে একবার সম্পদের একাংশ দান করার অনুষ্ঠানই নয়, এটা ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি। ইসলামী সরকারকে যাকাতের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা (Social Security) বিধানের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই দিয়েছেন। যাকাতের খাতগুলো থেকেই এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায়। যাকাতের সব কয়টি খাতই সেবামূলক ও অভাবীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা।

বিশ্বে খাদ্যাভাবের জন্য মানুষই দায়ী

প্রায়ই জাতিসংঘের FAO (Food And Agricultural Organization) নামক সংস্থার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, বিশ্বের উৎপাদিত খাদ্য যথাযথভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হলে বিশ্বে একজনও খাদ্যাভাবে কষ্ট পাবে না।

আল্লাহ তাআলা বিশ্বের সকল মানুষের জন্যই প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য-শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আমেরিকায় এত বিপুল পরিমাণ খাদ্য-শস্য উৎপাদিত হয়, যার এক-তৃতীয়াংশই সে সব দেশের লোকদের জন্য যথেষ্ট। এ খাদ্য পৃথিবীর বহু দেশের চাহিদা পূরণ করতে পারে। যে সব দেশে খাদ্যের ঘাটতি আছে ঐ সব দেশে আল্লাহ অন্যান্য সম্পদ দিয়েছেন, যার বিনিময়ে উদ্বৃত্ত দেশ থেকে এনে তাদের খাদ্য ঘাটতি দূর করা সম্ভব।

www.pathagar.com

একটি উদাহরণই এ বিষয়ের জন্য যথেষ্ট। বাংলাদেশে যে পাট উৎপন্ন হয় তা খাদ্যশস্যে উদ্বৃত্ত দেশের প্রয়োজন আছে। ঐ সব দেশে পাট উৎপন্ন হয় না। পাটের বিনিময়ে ন্যায্যমূল্যে খাদ্যশস্য পেলে বাংলাদেশের খাদ্য ঘাটতি পূরণ হতে পারে। কিন্তু যেহেতু খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না তাই পাটের বিনিময় মূল্যের তুলনায় খাদ্যের মূল্য অনেক বেশি দাবি করলেও দায়ে ঠেকে অন্যায় চড়ামূল্য দিতে বাধ্য হতে হয়।

এ কথা তথ্যসহকারে পত্র-পত্রিকায় বহুবার এসেছে যে, খাদ্যে উদ্বৃত্ত দেশে মানুষের খাদ্যশস্য পশুকে খাওয়ায়, গুদামে নষ্ট হলে সমুদ্রে ফেলে দেয়, তবু তারা বিনিময় মূল্য কমিয়ে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানি করে না। এভাবেই বিশ্বে মানুষ কৃত্রিমভাবে রিয্‌কের অভাব সৃষ্টি করে।

মানুষের প্রয়োজন পূরণের উপযোগী যত বস্তু আছে, এর সবই সব দেশে উৎপন্ন হয় না। যত জিনিস অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে গণ্য, এর সবগুলোও এক দেশে পাওয়া যায় না। বিশ্বস্রষ্টা বিভিন্ন সম্পদ বিভিন্ন দেশে দান করেছেন। মরুভূমির দেশে পেট্রোল বেশি পরিমাণে দিয়েছেন। খাদ্যে উদ্বৃত্ত দেশগুলো খাদ্যের বিনিময়ে পেট্রোল নিচ্ছে, আর মরুভূমির দেশ খাদ্য আমদানি করছে।

এভাবে আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে পরস্পর নির্ভরশীল করে রেখেছেন, যাতে দেশে-দেশে ও জাতিতে জাতিতে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হয়। কিন্তু সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থবোধের কারণে বিনিময় হার ইনসাফপূর্ণ না হওয়ায় খাদ্যে ঘাটতি দেশগুলো তাদের পণ্য ও সম্পদের ন্যায্য বিনিময় মূল্য পায় না।

বিশ্বে যারা দেশে দেশে ক্ষমতাসীন আছেন, তারা যদি আল্লাহর খলীফার দায়িত্ব পালনের যোগ্য হতেন তাহলে বর্তমান কৃত্রিম খাদ্য ঘাটতিতে মানুষ রিয্‌কের অভাবে কষ্ট পেত না।

তৃতীয় দফা ঃ কল্যাণমূলক কাজ চালু করা

মুসলিম শাসকদের তৃতীয় কর্তব্য হল, যা কিছু মানুষের জন্য কল্যাণকর তা সরকারি প্রচেষ্টায় চালু করা। কুরআন পাকে কল্যাণকর কার্যাবলিকে مَعْرُوْفٌ (মা'রূফ) বলা হয়েছে। عَرْفٌ শব্দ থেকে মা'রূফ শব্দটি গঠিত। عَرْفٌ মানে জানা। এ থেকেই তা'রীফ মানে পরিচয়, সংজ্ঞা এবং মা'রূফ মানে পরিচিত বা যা জানা আছে।

কুরআনে ভাল কাজ বুঝাবার জন্য মা'রূফ শব্দ ব্যবহার করার গভীর তাৎপর্য রয়েছে। মানুষকে ভাল ও মন্দের যে চেতনা দেওয়া হয়েছে তার ফলে কোন্‌টা ভাল তা মানুষের নিকট অত্যন্ত পরিচিত। বিবেক যে সব কাজের পক্ষে মত দেয় তা-ই মা'রূফ। সত্য বলা যে ভাল তা মিথ্যুকের নিকটও পরিচিত।

www.pathagar.com

যে সব কাজ দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য সত্যিই কল্যাণকর তা সরকারি উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও তদারকিতে চালু করার এ দায়িত্ব বড়ই ব্যাপক। অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, উৎসাহ ও সহযোগিতা পেলে সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হতে পারে।

কুরআন ও হাদীসে কল্যাণমূলক কাজের জন্য اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ বা 'ভাল কাজের আদেশ' পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আদেশের পেছনে শক্তি বা 'অথরিটি' থাকে। কারণ ক্ষমতা প্রয়োগের যোগ্যতা না থাকলে আদেশ দেওয়া যায় না। আর আদেশ দেওয়া মানে কাজটি হতে হবে। যে আদেশ দেয় সে চায় যে, তার আদেশ মান্য করা হোক এবং যে কাজের আদেশ দেওয়া হল তা করা হোক।

আদেশ আর উপদেশ এক কথা নয়। ভাল কাজের উপদেশ, ওয়াজ ও নসীহত তারাই দেন, যাদের আদেশ করার ক্ষমতা নেই বা যারা আদেশ করলেই কাজটি হয়ে যাবে না। আদেশ করা তার পক্ষেই সাজে, যে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে কাজটি আদায় করে নিতে পারে এবং আদেশ অমান্য করলে শাস্তি দেবার ক্ষমতা রাখে।

ইসলামী রাষ্ট্রের উপর আল্লাহ তাআলা দায়িত্ব দিয়েছেন যে, যা কিছু কল্যাণকর তা জনগণের মধ্যে চালু করার জন্য আদেশের হাতিয়ার ব্যবহার করবে। সরকারের পক্ষ থেকে শুধু উপদেশ দান করা যথেষ্ট নয়। উপদেশে কাজ না হলে আদেশ দিয়েই কাজ আদায় করতে হবে। আধুনিক যুগে কল্যাণ রাষ্ট্রের যে ধারণা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তা ইসলাম বহু শতাব্দী পূর্বেই প্রয়োগ করেছে।

শ' দেড়'শ বছর আগেও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার পুলিশী দায়িত্বই শুধু রাষ্ট্রের হাতে থাকা উচিত বলে রাজনৈতিক মতবাদ চালু ছিল। ইতিবাচক কোন কাজের দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে থাকা ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরোধী বলে গণ্য হত, অধুনা কল্যাণ রাষ্ট্রের (Welfare state) ধারণা ব্যাপক সমর্থন লাভ করায় ইতিবাচক কার্যক্রম দ্রুত বেড়ে চলেছে।

ইসলামী পরিভাষায়, اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ

অর্থাৎ ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ কথাটি কুরআন ও হাদীসে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু সরকারি পর্যায়েই নয়; বেসরকারি পর্যায়েও—পরিবারে, সমাজে, প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বশীলদের উপর এ কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যার যেখানে যতটুকু কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব ও প্রাধান্য রয়েছে তা প্রয়োগ করে ভাল কাজের আদেশ করা ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার দায়িত্ব পালনের উপর ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে।

www.pathagar.com

চতুর্থ দফা ঃ অনিষ্টকর কাজ বন্ধ করা

মুসলিম শাসকদের চতুর্থ দফা কর্তব্য হল ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ, জাতি ও পরিবেশের জন্য অনিষ্টকর যাবতীয় কার্যকলাপ থেকে জনগণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সরকারিভাবে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে অনিষ্টতার উৎসমূল পর্যন্ত উৎপাটন করার ব্যবস্থা করা। এ বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কাজটির জন্য কুরআন ও হাদীসে যে পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। এর নাম দেওয়া হয়েছে اَلنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ বা মুনকার থেকে নিষেধ করা। نَهْىٌ শব্দের অর্থ নিষেধ, Prohibit, prevent, forbid ইত্যাদি। আর مُنْكَرٌ শব্দটি اِنْكَارٌ থেকে গঠিত। ইনকার মানে অস্বীকার Denial। আর মুনকার মানে অস্বীকৃতি, যাকে অস্বীকার করা হয়েছে, Denied, unacknowledged. এ সব শাব্দিক অর্থ অভিধানেই রয়েছে।

মুনকার শব্দের অর্থ করা হয় মন্দ, নিষিদ্ধ ও অনিষ্টকর কাজ। এগুলো এর আভিধানিক অর্থ নয়, পারিভাষিক অর্থ। অনিষ্টকর কাজের জন্য মুনকার শব্দের ব্যবহার চমৎকার তাৎপর্য বহন করে। আল্লাহ পাক মন্দ কাজ বুঝাবার জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করে মানুষের বিবেককে নাড়া দিয়েছেন। অর্থাৎ হে মানুষ তোমাদের বিবেক যে সব বিষয়কে ভাল বলে স্বীকার করে না, যে সব কাজকে সমর্থন করতে অস্বীকার করে তা থেকেই তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। তোমাদের বিবেকের বিরুদ্ধে না চলার জন্যই বলা হয়েছে। যে সব থেকে তোমাদেরকে ফিরে থাকতে বা দূরে থাকতে বলা হয়েছে এর কোনটাকেই তোমাদের বিবেক ভাল বলে স্বীকার করে না।

আদেশদাতা যেমন ক্ষমতার অধিকারী, নিষেধকারীও তেমনি। অথরিটি ছাড়া নিষেধ করা সাজে না। আবার অথরিটি যার আছে তার পক্ষে অনুরোধ করাও স্বাভাবিক নয়। যারা ওয়াজ করেন তারা মন্দ কাজ থেকে ফিরে থাকার জন্য উপদেশ বা পরামর্শ দেন, অথবা অনুরোধ জানান। কারণ তাদের নিষেধ করার সাধ্য নেই। নিষেধ সে-ই করতে পারে যে তা অমান্য করলে শাস্তি দেবার ক্ষমতা রাখে।

'নাহী আ'নিল মুনকার' বা অনিষ্টকর কাজ থেকে নিষেধ করার কর্তব্যটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। শাসকগণ এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করলে সমাজের জন্য ক্ষতিকর কোন কাজই অবাধে, প্রকাশ্যে ও ব্যাপক পরিমাণে চালু থাকতে পারে না। আরও স্পষ্ট ভাষায় বলতে হয় যে, যাবতীয় মুনকার শাসকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনেই চালু থাকে।

www.pathagar.com

যুবতী-কিশোরী অপহরণ, ধর্ষণ, হত্যার ব্যাপকতায় সবাই পেরেশান। অথচ সিনেমা, ভিসিআর এবং সংস্কৃতির নামে অশ্লীল নৃত্য তরুণ ও যুব সমাজের চরিত্র ধ্বংস করছে দেখেও সরকারের পক্ষ থেকে সামান্য বাধাও দেওয়া হচ্ছে না। প্রশাসনের অশ্লীলতা বন্ধ করার নিয়ত থাকলে দিন দিন এ সব এভাবে বৃদ্ধি পেতে পারত না।

ঘুষ, দুর্নীতি, অবৈধ সম্পদ অর্জন ও শোষণ থেকে জনগণকে রক্ষা করার দায়িত্ব যে শাসকদের উপর রয়েছে, তারাই সরাসরি এ সব চালু করেছে। এ সব নীচ থেকে শুরু হয়নি। উপর থেকেই নাযিল হয়েছে।

উদাহরণের সংখ্যা বৃদ্ধি না করে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, 'মুনকার' পদবাচ্য সবই শাসকদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সমর্থন ও অনুমোদন ছাড়া সমাজে ব্যাপকতা লাভ করতে পারে না। অনিষ্টকর সব কিছু বন্ধ করা শাসকদেরই দায়িত্ব। তাই আল্লাহ তাআলা মুসলিম শাসকদের প্রধান ৪টি কর্তব্যের মধ্যে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি শামিল করেছেন।

মুসলিম শাসকদের ৪ দফা কর্তব্যের শেষ দুটো দফা মানব সমাজের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহ তাআলা গোটা মানব জাতির মধ্যে এ দুটো কাজ চালু করা মুসলিম জাতির দায়িত্ব বলে আল কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

অর্থ ঃ (হে মুসলিম উম্মত) তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। তোমাদেরকে মানব জাতির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাদের দায়িত্ব হল যা কল্যাণকর তার দিকে আদেশ করা ও যা অনিষ্টকর তা বন্ধ করা।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

যেখানে গোটা বিশ্বেই মা'রূফ চালু করা ও মুনকার বন্ধ করা মুসলিম জাতির কর্তব্য, সেখানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশেও মুসলিম নামধারী শাসকগণ এ কর্তব্য যথাযথ পালন করছে না। এর আসল কারণ শাসকদের মন, মগজ ও চরিত্র ইসলাম অনুযায়ী গঠিত নয়। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৩ বছর পর্যন্ত এমন একদল লোক তৈরি করলেন, যাদেরকে নিয়ে মদীনায় ইসলামী সরকার গঠন করে ঐ ৪ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলেন।

www.pathagar.com

খলীফা পরিভাষাটির বিশেষ গুরুত্ব

খিলাফতের দায়িত্ব যারা পালন করেন তারাই খলীফা। আল্লাহ তাআলা মানব সৃষ্টির পূর্বে ফেরেশতাগণকে জানালেন যে ঃ

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ـ

অর্থ ঃ আমি পৃথিবীতে খলীফা পাঠাতে চাচ্ছি। (সূরা আল বাকারা ঃ ৩০)

ইতঃপূর্বে আর কোন সৃষ্টিকে খলীফার মর্যাদা দেওয়া হয়নি বলেই এ নতুন সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি জানালেন। একমাত্র মানুষকেই এ মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। আর সব সৃষ্টি শুধু দাস। মানুষ শুধু দাস নয়; খলীফাও।

সৃষ্টিলোকে কাউকেই মালিকানা শক্তি দেওয়া হয়নি। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও মানুষেরও মালিক বা মনিব হবার সাধ্য নেই। সৃষ্টির সেরা হিসেবে মানুষকেই শুধু খলীফার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

মানুষ যত বিরাট ক্ষমতা ও অগাধ সম্পদের অধিকারীই হোক, সে এর কোনটারই আসল মালিক নয়। যিনি আসল মালিক তিনি যে কোন সময় এসব ছিনিয়ে নেবার ক্ষমতা রাখেন। মৃত্যু দিয়ে এ সব থেকেই বঞ্চিত করতে পারেন।

অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষের মালিক বা মনিব হওয়ার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ তাকে শুধু খলীফা হওয়ারই অধিকার দিয়েছেন। এর চেয়ে বড় কোন পজিশন দেননি।

এ আয়াতে এ কথা বলা হয়নি যে, মানুষ কার খলীফা হবে। যেহেতু মানুষকে সিদ্ধান্ত নেবার এখতিয়ার দিয়েছেন, সেহেতু মানুষ ইচ্ছা করলে আল্লাহর খলীফা হতে পারে। এটাই তার যথার্থ মর্যাদা। আল্লাহ এটাই পছন্দ করেন যে, মানুষ আল্লাহর খলীফা হোক।

কিন্তু কোন মানুষ যদি আল্লাহর খলীফা হবার জন্য ইচ্ছা না রাখে এবং চেষ্টা না করে তাহলে অবশ্যই সে শয়তানের খলীফা হবে। কারণ তার তো আর কিছু হবার উপায় নেই। তাকে খলীফাই হতে হবে। হয় সে আল্লাহর খলীফা হবে, না হয় শয়তানের খলীফা হবে।

খলীফা হওয়ার কারণেই মানুষের এত ক্ষমতা

মানুষকে খলীফার মর্যাদা দেবার কারণেই গোটা সৃষ্টি জগতকে ব্যবহার করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে মানুষ এত শক্তির অধিকারী হয়েছে। আজ মানুষ পাখির চেয়েও দ্রুত উড়তে সক্ষম। জলে, স্থলে, আকাশে সর্বত্র মানুষের অবাধ বিচরণের যোগ্যতা আছে।

www.pathagar.com

সৌরশক্তি, আনবিক শকি, বিদ্যুৎশক্তি এবং প্রাকৃতিক সকল উপাদানই মানুষ ব্যবহার করছে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে বিচরণ করার যোগ্যতাও মানুষ অর্জন করে ফেলেছে। ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইটের বদৌলতে ঘরে বসে বিশ্বের জ্ঞানসমুদ্র মন্থনের অধিকারও ভোগ করা সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু মানুষের এ বিরাট ক্ষমতা মানব জাতির কল্যাণে কতটুকু ব্যবহার করা হচ্ছে? এ সব শক্তি কি যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ত্রাস, জুলুম-নির্যাতন, শোষণ ও প্রতারণার উদ্দেশ্যেই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে না? মানব সমাজে বর্তমানে যে চরম নিরাপত্তাহীনতা, অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি বিরাজ করছে বিজ্ঞানের এ বিস্ময়কর উন্নতির পূর্বে এমন দুরবস্থা কখনো ছিল না।

জ্ঞান, বিজ্ঞান ও কৃষ্টি-সভ্যতার এত অগ্রগতি সত্ত্বেও মানব জাতি আজ সর্বত্র অশান্তি ভোগ করছে। এর জন্য দায়ী কারা? আল্লাহ তাআলা সূরা রূমের ৪১ আয়াতে এ প্রশ্নের জওয়াব এভাবে দিয়েছেন ঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ -

অর্থ ঃ জলে, স্থলে যে বিশৃঙ্খলা কায়েম হয়ে আছে তা মানুষেরই হাতের কামাই।

আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, আমি মানুষের উপর অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা চাপিয়ে দেইনি। মানুষের নিজের কৃতকর্মের ফলেই সর্বত্র ফিৎনা-ফাসাদ কায়েম আছে।

আল্লাহ তাআলা মানুষের সুখ-শান্তির জন্য যে প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন, সেখানে মানুষ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে চলেছে। বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, পানি দূষণ ইত্যাদির ফলে আল্লাহর দেওয়া নির্মল আবহাওয়া দূষিত হয়ে মানুষের অস্তিত্বের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্প-কারখানা, যানবাহন ও অন্যান্য বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে আকাশে ওজোনস্তর ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে পৃথিবীর উষ্ণতা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় সারা বিশ্বে আবহাওয়া মানুষের জন্য বিপদসঙ্কুল হয়ে পড়ছে। এ সবই বিজ্ঞানের উন্নতির কুফল।

সৃষ্টিজগৎকে ব্যবহার করার যে বিরাট ক্ষমতা মানুষের হস্তগত হয়েছে এ ক্ষমতাই মানব সভ্যতা ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর আসল কারণ এটাই যে, মানুষ আল্লাহর খলীফা না হয়ে শয়তানের খলীফা হিসেবে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সুফল মানুষ ভোগ করতে পারছে না। এটা বিজ্ঞানের দোষ নয়। বিজ্ঞানের অবদানকে অন্যায়ভাবে ব্যবহারের পরিণামেই মানুষের জীবনে শান্তির বদলে অশান্তি বেড়ে চলেছে।

–সমাপ্ত–

www.pathagar.com

কামিয়াব প্রকাশন-এর বই

ফিক্‌হুস সিরাত (অনুদিত)	-মুহাম্মদ আল গাযালী আল মিসরী
জীবনে যা দেখলাম	-অধ্যাপক গোলাম আযম
জীবন্ত নামায	-অধ্যাপক গোলাম আযম
মযবুত ঈমান	-অধ্যাপক গোলাম আযম
আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি	-অধ্যাপক গোলাম আযম
সাহিত্য-শিল্প	-ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ
কুরআনের পরিভাষা	-ডক্টর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
আল মুনীর সিয়াম স্মারক গ্রন্থ	-মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন সম্পাদিত
মুসলিম ধর্মতত্ত্বে ইমাম গাযালীর অবদান	-ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ
আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী	-ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ
আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তার দাবি	-আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
চাকুরী পদোন্নতি ও পেশাগত সাফল্য	-এ জেড এম শামসুল আলম
সাইয়েদ কুতুব ঃ জীবন ও কর্ম	-আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ
মানুষের শেষ ঠিকানা	-আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ
হিমালয় দুহিতার উষ্ণতায়	-সালমান আযামী
বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা	-মোহাম্মদ শাহ আলম
আমার কাল ঃ আমার চিন্তা	-শাহ্ আব্দুল হান্নান
ইবনে বতুতার সফরনামা	-মুহাম্মদ জালালউদ্দিন বিশ্বাস অনুদিত
মুসলিম মহিলা রত্ন	-মুহাম্মদ জালালউদ্দিন বিশ্বাস অনুদিত
ছোটদের প্রিয়তম নবী (স)	-মুহাম্মদ জালালউদ্দিন বিশ্বাস
কুরআন সুরক্ষিত (অনুদিত)	-ডক্টর ইলতিফাত আহমদ
হযরত মুহাম্মদ (স) ও ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ (অনুদিত)	-ডক্টর এম এ শ্রীবাস্তব
মাসাইল সংকলন	-মোঃ হেফজুর রহমান
আমি কেন আল্লাহকে বিশ্বাস করি	-শেখ মোসলেম উদ্দিন
প্রাকটিস অফ হারবাল মেডিসিন	-শামুনুর রশিদ

ব্যবসায়িক পরিচ্ছন্নতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে কামিয়াব প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত বইসমূহ নির্ধারিত মূল্যে (একদামে) বিক্রয় করা হয়।